ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1218-1225
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.342

ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক রাঢ় বাংলায় হিন্দু-মুসলিম যৌথ ধর্মীয় উপাসনা ও মানত প্রথার দৃষ্টান্ত

মুন্সী মহ: সাহেবুর রহিম, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the socio-religious and cultural history of Rarh Bengal, the practice of joint Hindu–Muslim worship and vow-making (manat) constitute a significant feature. Through the interaction of Sufism and the worship of regional folk deities, a syncretic culture developed in Bengal in which pirs and local deities often became interchangeable. Deities and pirs such as Fatema Bibi, Bonbibi, Olabibi, Satyapir, Gorachand Pir, Barakhan Gazi, Manasa, and Olaichandi are worshipped by both Hindu and Muslim communities. As a result, the presence of Muslims in Hindu temples and the participation of Hindus in Muslim shrines have become a traditional social reality in various parts of Rarh Bengal.

Field studies reveal numerous examples of such shared religious practices across the districts of Hooghly, Birbhum, Murshidabad, Bankura, and Bardhaman. For instance, in Jamgram of Hooghly, it is customary during the Durga Puja of the Nandi family to serve food to a Muslim fakir and to offer *shirni* at a pir's shrine. At the Bishalakshmi temple in Kalachhara, both Hindus and Muslims perform vows. In Khajutipara village of Birbhum, Muslims offer fruits and milk during the worship of Dharmaraj Thakur, and the consecrated food is shared by all. In Bhandarkata village of Mohammad Bazar, Kali Puja is organized by the Muslim community.

Similar practices are observed in Murshidabad, Bankura, and Bardhaman districts, where Muslim households host Hindu deities or actively participate in the maintenance of Hindu temples. Examples include the shrine of Dinadayal at Nawpara in Bardhaman, the Panchanan Thakur shrine at Yabgram, the worship of Dharmapir or Dharmaraj at Sabajpur, and the Jagannath Pir shrine at Ketugram. In all these places, both communities equally participate in vows, rituals, and festivals.

This field study indicates that in the rural society of Rarh Bengal, mutual coexistence, shared beliefs, and regional traditions have played a more significant role than religious divisions. Thus, the practices of joint worship and vow-making stand as a remarkable historical testimony to the pluralistic culture and communal harmony of Rarh Bengal.

Keywords: Sufi, Pir, Fateha, Astana, Hajat, Atan, Shirni, Kafir, Manat, Fakir, Than, Dargah

রাঢ় বাংলায় লৌকিক পির ও লৌকিক দেবদেবী সমার্থক হয়ে আছে। ঐতিহাসিক ও গাজীপির ছাড়াও ফাতেমা বিবি, বনবিবি[১], ওলাবিবি[২], ওলাইচণ্ডী, মনসা, বড়খাঁ গাজী, পির গোরাচাঁদ ও সত্যনারায়ণ বা সত্যপির, মানিকপির[৩] খজখেজের[৪] প্রভৃতি লৌকিক পির বা লৌকিক দেবদেবী হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী দ্বারা পূজা ও হাজত পান। বাংলায় সুফিবাদ ও লৌকিক দেবদেবীদের মিশ্রণে এক ধরনের মিশ্র ধর্মীয় সমাজ সংস্কৃতি

গড়ে ওঠে। যার ফল আজও বাংলা তথা রাঢ় বাংলায় রয়েছে। যার ফলস্বরূপ হিন্দু পুজোয় মুসলিমদের অংশগ্রহণ এবং মুসলিম পিরের থানে হিন্দুদের আগমন ঘটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় হিন্দু বাড়িতে যেমন মুসলমানদের পিরের থান রয়েছে, আবার মুসলিমদের বাড়িতে হিন্দু লৌকিক দেবদেবীর থান রয়েছে। এগুলি সবই মিশ্র সংস্কৃতির ফল। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে থানগুলি যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

হুগলি জেলার পান্ডুয়ার কাছে অবস্থিত জামগ্রাম। এখানে রয়েছে নন্দী পরিবারের শ্রী শ্রী লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুরের মন্দির, ঠাকুরদালান ও রাসমঞ্চ।[৫] এগুলি সবই স্থাপিত হয়েছে উনিশ শতকে। এই নন্দী বাড়ির দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজোর আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শোনা যায় এই পরিবারের দশ পুরুষ পূর্বে জামগ্রামে হাপুরজি নামক এক সুফি ফকিরের আশীর্বাদে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। তারপর থেকে প্রতি বছর এই পরিবারের পুজোয় কিছু নিয়ম চালু হয়। যেমন দুর্গাপুজোর নবমী তিথিতে প্রথমে দুজন মুসলিম ফকিরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে। এই ফকিরের অন্ন গ্রহণের পরই বাকী ভক্তগণ ও পরিবারের সদস্যরা নবমীর প্রসাদ গ্রহণ করবে। পাশাপাশি লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন নন্দী বাড়ি থেকে ভোরবেলায় শোভাযাত্রা বের হয়। প্রথমে এই শোভাযাত্রা আসে হাপুরজি পিরের মাজারে। মাজারে শিরনি হিসাবে বাতাসা ফল গুড় চিড়ে দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। পিরের বাতাসা সহ ভোগ বড়-ছোট নর-নারী সকলেই আনন্দে ভাগ করে নেন।[৬] এইভাবে জামগ্রামে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। ফকিরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো বা পিরের দরগায় শিরনি বিতরণ করে পুজোর সমাপ্তি- কোনো ক্ষেত্রেই হিন্দু ধর্ম উচ্ছন্নে যায়নি বা মুসলিম ধর্মের কেউ কাফের, বিধর্মী হয়ে যায়নি, বরং সম্প্রীতি বজায় এই ঐতিহ্য আজও চালু রয়েছে।

হুগলি জেলার চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত কলাছড়া পল্লীর বিশালাক্ষী মন্দির[৭], মন্দিরের ফলকটি ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে খোদিত, সম্ভবত সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন। দেবীর মূর্তি চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, পদতলে শায়িত শিব, এবং শিবের পাশে নীলবর্ণ মহাকাল বা কালভৈরব উপবিষ্ট। শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে নিত্য পূজা হয়। বাৎসরিক পূজা হয়, সেই সঙ্গে মেলা বসে ও পাঁচালী গান হয়। পাঁচালী গানে হিন্দু-মুসলিম সকলে অংশ নেন। মানসিকের জন্য হিন্দুরা পাঁঠা মুরগি বাতাসা, মুসলমানরা মুরগি পোড়ামাটির লাল কালো ঘোড়া নিবেদন করেন। গ্রামবাসীদের মতে, দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। ভক্তিভরে পূজা করলে রোগমুক্তি, মহামারী প্রতিরোধ, দুর্যোগ নিবারণ হয়। বহু ভক্ত রোগমুক্তি পাওয়ার দাবি করেছেন, মুসলিম মানতকারী সামী হোসেন সুস্থ হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা জানান। সুতরাং বিশালাক্ষী দেবী আঞ্চলিক লৌকিক উপাসনার প্রতীক, যিনি পরে শাস্ত্রীয় দেবতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি আর্য অনার্য, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে গঠিত। কলাছড়া অঞ্চলে তাঁর মন্দির শুধুমাত্র ধর্মীয় স্থান নয়, বরং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরও কেন্দ্র[৮]।

হুগলির বটেশ্বর মন্দিরে এবং তারকেশ্বর মন্দিরে ওই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় আসেন, পূজা দেন ও মানত করেন[৯]।

বীরভূম জেলার নানুর থানার খাজুটিপাড়া গ্রামে নিম গাছের নীচে ধর্মরাজ ঠাকুরের আটন আছে। নিয়মিত ধূপ দেওয়া হয়। গ্রামটিতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই বসবাস করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় মুসলিমগণ দেবতার উদ্দেশ্যে ফল ও দুধ ইত্যাদি দিয়ে যান। হিন্দুগণ তা সাদরে গ্রহণ করেন। তারপর ভোগ রান্না হলে তা হিন্দু-মুসলিম সকলেই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তাদের বিশ্বাস স্নান করে এসে মুক্তমনে দেবতার ভোগ গ্রহণ করলে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।[১০]

বীরভূম জেলার মহম্মদ বাজার থানার ভাঁড়কাটা গ্রামে কালীপূজা হয়। গ্রামটিতে বেশিরভাগ বসবাসকারী মুসলিম। কালীপূজার উদ্যোগ মুসলিমরাই করেন। এই কালী পূজা উপলক্ষে সেখানে প্রতিবছর একটি মেলা বসে। মেলা প্রায় ৬/৭ দিন ধরে চলে। মেলাতে বসে কবি গানের আসর। দেবীকে সমগ্র গ্রাম পরিক্রমা করানো হয়, যার দায়িত্বে থাকেন মুসলমানগণ। তাঁরা দেবীকে নিয়ে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম প্রায় সব বাড়ির সামনে নামান। বাড়ি থেকে লোকজন বের হয়ে দেবীকে দর্শন করেন। কেউ মানসিক করে থাকলে তা সেইসময় শোধ করে দেন। আবার কেউ কেউ সেই দিন কোন নতুন আশা নিয়ে দেবীর কাছে মানত ও করেন। বাড়িতে বাড়িতে জ্বলে দীপাবলির আলো।[১১]

মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপি বড়ুয়া থানার মুনুটিয়া গ্রামের 'জটাধারী তলা' হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির এক অনন্য নিদর্শন। মুসলিম পাড়ায় অবস্থিত শিবমন্দিরটি স্থানীয় মুসলমানদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ হয়। এখানে শিব ও পঞ্চ নাগের মূর্তি পূজিত হয়। প্রতি বছর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে গাজন উৎসব তিনদিন ধরে উদযাপন হয়, যার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর। উৎসবকালে মেলা বসে এবং বৃহস্পতি ও শনিবারে সবচেয়ে বেশি ভক্তের সমাগম ঘটে। অনেক মুসলিম মহিলা এখানে মানত করে উপকার লাভ করেছেন বলে জানান।[১২] জটাধারী তলার এই উৎসব ও পূজাচর্চা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সহাবস্থান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মিলনের এক বাস্তব উদাহরণ হিসেবে গ্রামীণ বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকটি তুলে ধরে।

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা থানার নওপুকুরিয়া গ্রামে মা ডুমনির আটন আছে। ঐ ডুমনির আটনটি প্রায় পাঁচশত বছরের পুরাতন বলে জানা যায়। মা ডুমনী ওই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের জাগ্রত দেবী বলে খ্যাত। মৃত্যু বৎসা দোষ খন্ডন, বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনা, দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি ইত্যাদির জন্য ওই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম সকলেই দেবীর কাছে মানত করেন। কলকাতা, মালদহ, রাজশাহী, বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি দূর-দূরান্ত স্থান থেকেও বহু ভক্ত দেবীর নিকট আসেন। এই দেবীর বিশেষ বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে। সেদিন দেবীর উদ্দেশ্যে চিড়ে ও দই দিয়ে প্রসাদ তৈরি হয় এবং দুপুরে পায়েস ও খিচুড়ি রান্না হয়। হিন্দু-মুসলিম সকলেই সেদিন রান্নাতে সাহায্য করেন এবং মহানন্দে সকলেই ভোজন করেন। মন্দিরের সেবায়েতকে[১৩] এর ইতিহাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-লিখিত কোনো ইতিহাস জানা নেই। তারা বংশ পরম্পরায় এই দেবতার আরাধনা করে আসছে। দেবতার বহু মুসলমান ভক্ত আছে। এইভাবে ওই অঞ্চলে উঠেছে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রতীর মিলন ক্ষেত্র।

মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর থানার, বেলডাঙ্গা-২ ব্লকের কাটাইকোনা গ্রামের বসির সেখের বাড়িতে হিন্দু দেবদেবী আটন আছে। আটনটিতে প্রতীক হিসাবে ঘরের কোণে একটি লোহার গফুরের বাহন আছে। কেউ কেউ সেটিকে নারায়ণের ঢেঁকির বাহনও বলে থাকেন। প্রতীকটি চার পা যুক্ত অনেকটা ঘোড়ার মতো দেখতে। আটনটির পুরোপুরি দেখাশোনা করেন তিনার স্ত্রী। ওই আটনের বাহক হিসাবে একশত এক জন হিন্দু দেবদেবীর তিনি আরাধনা করেন। তবে সবচেয়ে প্রাধান্য দেন দেবী মনসা ও শিবকে। তিনি প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা আটনের জায়গা পরিষ্কার করে ধুপ ধুনা দেন তারপর ভোগ নিবেদন হিসাবে যে কোন এক প্রকার মিষ্টি, জবাফুল ও বিভিন্ন রকমের ফল রাখেন। তাছাড়া প্রত্যেকদিন নিয়ম করে সেখানে গরুর কাঁচা দুধ ঢালা হয়। ঐ থানে প্রত্যেকদিন অনেক হিন্দু-মুসলিমের আগমন ঘটে। বছরের একটি বিশিষ্ট দিনে মহিলা বাড়িতে নিজের পয়সায় এক বিরাট অনুষ্ঠান করেন। সেই অনুষ্ঠানে দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ রান্না করা হয়। সেদিন হিন্দু-মুসলিম সকলেই মহানন্দে সেই ভোগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া মহিলাটি সপ্তাহে একদিন করে পাঁচ রকম ফল দিয়ে দেবতার প্রসাদ করেন যা হিন্দু-মুসলিম সকলেই ভক্ষণ করেন।[১৪]

বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের বিউর গ্রামের গাজন উৎসব ধর্মীয় সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রায় ৩০০ বছর ধরে চলে আসা এই উৎসব অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হয়ে বুদ্ধপূর্ণিমায় শেষ হয়। যদিও স্থানীয় সেন, সরকার এবং রায় পরিবার গাজনের আয়োজন করে, এটি আশপাশের অন্তত ১০টি গ্রামের সম্মিলিত উৎসব। এই গাজনের অন্যতম প্রধান অংশ হল বুদ্ধপূর্ণিমার হোম, যার জন্য কমপক্ষে এক সের ঘি প্রয়োজন হয়। বিশেষ বিষয় হলো, এই ঘি সরবরাহের দায়িত্ব প্রথাগতভাবে গ্রামের মল্লিকপাড়ার এক মুসলিম পরিবারের। ঐতিহ্য অনুসারে, ওই পরিবার থেকে ঘি না এলে সিদ্ধেশ্বরের হোম সম্পন্ন হয় না। শুধু তাই নয়, হিন্দু সন্ন্যাসীরা মুসলিম পরিবারগুলির পাঠানো ফল ও মিষ্টি খেয়ে উপবাস ভাঙেন। গ্রামের আনিসুর রহমান, যাঁর পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ঘি প্রস্তুত ও সরবরাহ করে আসছে, বলেন— "আমরা কে হিন্দু বা কে মুসলিম এভাবে ভাবি না। এটা আমাদের সকলের উৎসব।" এই দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য দেখায় যে ধর্ম কেবল বিশ্বাস নয়, সামাজিক ঐক্যেরও বাহক হতে পারে। বিউর গ্রাম সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আজও একই নিয়মে তার সংস্কৃতি বহন করে চলেছে।[১৫]

কোতুলপুর থানার মাধবগঞ্জে এক অজানা পিরস্থান রয়েছে। সেই পিরস্থানের পাশেই রয়েছে গঙ্গাধর শিবের মন্দির। শিবের গাজন অক্ষয় তৃতীয়ায় শুরু হয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমায় শেষ হয়। এখানে শিবের গাজন হওয়ার পূর্বে পিরের উরস পালিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো শিবের গাজনে ভোগদেয় পার্শ্ববর্তী ধুলাডাঙ্গার হাজারি পদবিধারী মুসলমান পরিবার।[১৬]

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার নওপাড়া গ্রামে আনসার আলী মণ্ডলের বাড়িতে দীনদয়ালের আটন রয়েছে, যা বহু প্রজন্ম ধরে হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের মিলনস্থল হয়ে আছে।[১৭] আনসার মণ্ডল জানান, তাঁর দাদু ছিলেন অগ্রদ্বীপের চরণপালের প্রথম শিষ্য এবং সেই পরম্পরা আজও বহমান। এই দীনদয়ালকে হিন্দুরা শিবের শক্তি রূপে পূজা করেন, আর মুসলমানরা ফকিরের দরবেশ রূপে উপাসনা করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভক্তরা এখানে সন্ধ্যা দেয়, মানসিক করে এবং সন্তান কামনা বা পারিবারিক মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করে। প্রতি বছর পৌষ মাসের ৫ তারিখে এখানে মহোৎসব হয়, যেখানে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হন। যদিও মুসলিম উপাসকের তুলনায় হিন্দু ভক্তদের সংখ্যা বেশি, তবে এই স্থান সর্বজনীন আস্থার প্রতীক হিসেবে টিকে আছে। নওপাড়ার বিশেষ দীনদয়াল শুধু ধর্মীয় উপাসনার কেন্দ্র নয়, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।[১৮]

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার যবগ্রামে অবস্থিত আমিনুল হক মোল্লার বাড়িতে পঞ্চানন ঠাকুরের (পাঁচু ঠাকুর) আটন রয়েছে, যা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের একতা ও আস্থার প্রতীক। পাঁচু ঠাকুর বাংলার বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন উপায়ে পূজিত হন, বিশেষ করে শিশুদের খিঁচুনি ও ধনুষ্টংকার নিরাময়ের দেবতা হিসেবে। ঠাকুরের থানে একটি মাটির ঢিপির চারপাশে অসংখ্য লাল-কালো পোড়ামাটির ঘোড়া ছড়িয়ে আছে, যা মানতের নিদর্শন হিসেবে মানুষ রেখে যায়। এছাড়া, সেখানে ছয়টি সাদা রঙের ঘোড়াও রয়েছে। প্রতিদিন বহু ভক্ত, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে, ঠাকুরের পবিত্র জল গ্রহণ করতে আসেন, যা শুভ কাজের পূর্বে ব্যবহার করা হয় এবং শিশুদের রোগমুক্তির আশায় তাদের চোখ-মুখ ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। মাঘ মাসের ১৭-১৮ তারিখে এখানে বড় উৎসব হয়, যেখানে বহু ভক্ত সমবেত হন। ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতির এক মহামিলন কেন্দ্র হিসেবে যবগ্রামের এই পঞ্চানন ঠাকুরের আটন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৯]

বর্ধমান জেলার ভাতার থানার এরুয়া গ্রামে, মবু শেখের বাড়িতে ধর্মরাজ ঠাকুরের আটন রয়েছে। এই ধর্মরাজ ঠাকুরকে 'পঞ্চানন' নামেও ডাকা হয়। অতীতে তিনি তিন সের চাল ও দুধ দিয়ে পূজিত হতেন এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাগাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। এই গাজনে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে অংশ নিতেন এবং একে অপরকে সহযোগিতা করতেন। বর্তমানে গাজন বন্ধ হয়ে গেলেও, অনেক হিন্দু ভক্ত এখনও এখানে পূজা দিতে আসেন, এবং মুসলমানরাও তাঁদের সহায়তা করেন। তাই অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাঁকুড়ার মন্দির গ্রন্থে বলেছেন–

> "অতি নিম্নবর্ণের আদিবাসী থেকে অতি উচ্চ বর্ণের হিন্দু ছাড়াও, কোন কোন স্থানে মুসলমান সম্প্রদায় অবধি ধর্মরাজের পূজা করে থাকেন।"[২০]

ঠাকুরটি এখন বাড়ির একটি ঘরের কোণে, বানের আড়ালে রাখা আছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার সাবাজপুর গ্রামে এক মুসলিম পরিবারের বাড়িতে ধর্মরাজ ঠাকুরের (স্থানীয়ভাবে 'ধর্ম পির') আটন রয়েছে। এই ধর্মরাজ ঠাকুরের কোনো মূর্তি নেই, তবে বাড়ির উঠানের এক কোণে লাল ও কালো পোড়ামাটির ঘোড়া রাখা আছে, যা দেবতার প্রতীক হিসেবে পূজিত হয়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভক্তরা দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি এবং নানা সমস্যার সমাধানের জন্য এখানে মানত করেন। ধর্মরাজ পূজা সাধারণত বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তার আগে থেকেই ভক্তরা উপবাস করেন। হিন্দু ভক্তরা বেলপাতা ও ফুল দিয়ে পূজা করেন, আর মুসলিম ভক্তরা 'ধর্মপির'র নামে শিরনি ও বাতাসা দিয়ে মানসিক পালন করেন। এই ধর্মরাজ বা ধর্মপির পূজায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষের একাত্মতা স্পষ্ট, যেখানে একসঙ্গে উপবাস, পূজা এবং ভক্তি প্রকাশ করা হয়। এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন, যেখানে ধর্ম-বর্ণের ব্যবধান ভুলে মানুষ একসঙ্গে প্রার্থনা করেন।[২১]

কাটোয়া থানার শ্রীবাটি গ্রাম, যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি, এবং সংলগ্ন নতুনগ্রাম, যেখানে মুসলিমদের আধিক্য রয়েছে— এই দুই গ্রাম প্রাকৃতিক শস্য-শ্যামল পরিবেশে অবস্থিত। শ্রীবাটি গ্রামে একটি প্রাচীন কালো পাথরের শিবলিঙ্গ আছে, যা হিন্দুরা শিবের প্রতীক বলে মানেন, আর মুসলিমরা একে বুড়োরাজ বা বুড়োপির হিসেবে পূজা করেন। চৈত্র মাসের নির্দিষ্ট একদিন শিবকে পালকিতে করে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যাওয়া হয়, শিবভক্ত জল সন্ন্যাসীদের সাথে। নতুনগ্রামের মুসলিম সম্প্রদায় এই উৎসবের অংশ হিসেবে একটি খামারবাড়ি পরিষ্কার করে রাখেন, যেখানে পালকি বিশ্রাম নেয়। পালকি এলে নতুনগ্রামের মুসলিম মেয়েরা অর্ঘ্য হিসেবে ফল, দুধ ও মিঠাই নিবেদন করেন এবং তাঁদের মানত শোধ করেন। এরপর শিবকে ঘিরে মেলা বসে, যার প্রধান দায়িত্ব পালন করেন মুসলমানরা। মেলায় শিবকে উদ্দেশ্য করে ভোগ রান্না করা হয় (যাতে বাতাসা, দুধ ও আতপ চাল থাকে), যা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই গ্রহণ করেন। যদিও শিবের পালকি সেখানে বেশিক্ষণ থাকে না, তবু সেই সময়ের মধ্যেই স্থানটি ধর্মীয় সহাবস্থান ও সম্প্রীতির এক মহাতীর্থ হয়ে ওঠে।[২২]

পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত জামালপুর গ্রামে অবস্থিত বুড়োরাজ ঠাকুরের মন্দির হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক অনন্য প্রতীক। বুড়োরাজকে স্থানীয় লৌকিক দেবতা হিসেবে পূজা করা হয়। গবেষকদের মতে, শিব ও ধর্মরাজের মিলিত প্রভাবেই এই দেবতার উদ্ভব হয়েছে। হিন্দুরা তাঁকে বুড়োরাজ নামে ডাকেন, আর মুসলমানরা তাঁকে জামালউদ্দিন পির বলে সম্মান করেন। জামালপুরের কাছাকাছি নিমদহ গ্রামে একটি মুসলিম পরিবার থেকে বুড়োরাজের পুজোর জন্য বাঁশের নতুন মই তৈরি করা হয়। এই মইতে সাজানো অর্ঘ্য প্রথমে জামালউদ্দিন পিরের কাছে নিবেদন করা হয়, তারপর অন্য ভক্তরা তাঁদের অর্ঘ্য দেন। বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় এবং মানত করার জন্য মানুষ এখানে আসেন। ভক্তদের বিশ্বাস, এই দরবারে মানত করলে বোবা কথা বলতে পারে, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হয় এবং নিঃসন্তানরা সন্তান লাভ করেন। বৈশাখী

পূর্ণিমায় এখানে বুড়োরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়,[২৩] যেখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করেন। গাজনের সময় বিশাল মেলা বসে, যা বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে ব্যবসায়ীদের আকর্ষণ করে। মেলা বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে শুরু হয়ে দু'দিন ধরে চলে। এই কাহিনী ধর্মীয় সহাবস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে এক দেবতাকে শ্রদ্ধা জানায় এবং তাঁর কাছে মানত করেন।

এই বুড়োরাজ-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মন্তেশ্বর ব্লকের পিপলন মৌজার ইচু ভাগড়া গ্রামে এক সমন্বয়ী পূজার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত এই স্থানে মুসলিম হিন্দু পাশাপাশি বসবাস করে। এখানে মুসলিম বসতির পাশে একটি শ্রী শ্রী বুড়োরাজ জিউ নামক একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরে পূজারী পিপলন গ্রামের ব্রাহ্মণ হলেও পুজো করার পূর্বে মুসলিমরা ফলমূল দিয়ে পুজোর বন্দোবস্ত করেন। মুসলমানদের দেওয়া অর্ঘ্যে পুজো সম্পূর্ণ হওয়ার পর হিন্দুরা পুজো দেন। শুধু তাই নয় এই পুজোর সময় আশেপাশের হিন্দু মুসলিম বাড়িতে চুলো জ্বালানো নিষেধ। পুজো সম্পন্ন হওয়ার পর তারা রান্না করে খাওয়া দাওয়া করেন। তাদের বিশ্বাস এইকাজে বুড়োরাজ খুশি হন। কোন শুভ কাজ শুরু করা, বিবাহের বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি কাজে বুড়োরাজকে তারা স্মরণ করে। পুজো নিত্যদিন হলেও প্রধান পুজো হয় মাঘ পূর্ণিমা ও বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস নাগাদ।[২৪]

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত কুন্দা গ্রামে অবস্থিত কুন্দাক্ষী দেবী ধর্মীয় সহাবস্থানের একটি চমৎকার উদাহরণ। মনে করা হয়, সেন আমলে যখন বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই এই মন্দিরটিরও নির্মাণ হয়। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে, কুন্দাক্ষী দেবীকে মনসার রূপ হিসেবে পূজা করা হয়। গ্রামে আলাদাভাবে মনসার পূজা না করে কুন্দাক্ষীকেই মনসা দেবীর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই দেবীর পূজার সাথে একটি অনন্য হিন্দু-মুসলিম মিলন সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। আগে গ্রামের একটি বিশেষ মুসলিম পরিবার থেকে দেবীর পূজার জন্য অর্ঘ্য ও একটি ছাগল দেওয়া হতো। এই অর্ঘ্য আসার পর পুরোহিত সেই মুসলিম ব্যক্তির কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে তাকে সম্মান জানাতেন, তারপর পূজা শুরু হতো। নাগ পঞ্চমীতে বিশেষভাবে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়, এবং ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে কুন্দাক্ষী দেবী অত্যন্ত জাগ্রত। বিপদ-আপদে কিংবা শুভ কাজের আগে গ্রামবাসীরা তাঁর কাছে মানত করেন। এই ঘটনাগুলো ধর্মীয় সম্প্রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ, যা গ্রামবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ঐক্যের পরিচয় বহন করে।[২৫]

বর্ধমান জেলার সদর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামের ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি সুন্দর উদাহরণ তুলে ধরে। গ্রামটিতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস থাকলেও তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, গ্রামের মুসলিম পাড়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শিবের আটন (একটি পাথরের শিবলিঙ্গ), যা মুসলমানরা সযত্নে রক্ষা করে। তারা নিশ্চিত করেন যে এটি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদিও নিত্য পূজা হয় না, তবে বছরে একবার শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরাও সমানভাবে অংশ নেন এবং হিন্দুদের সহায়তা করেন। এই বিবরণটি ধর্মীয় সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে উঠে আসে, যেখানে ভিন্ন ধর্মের মানুষ পরস্পরের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে বসবাস করেন।[২৬] সুতরাং হিন্দু বাড়িতে পিরের ধান মুসলিম বাড়িতে হিন্দু দেবদেবীর আটন থেকে প্রমাণিত হয় হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি অতীতেও ছিল আজও রয়েছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত কান্দরা গ্রামে দক্ষিণ পাড়ায় হিন্দু মুসলমান'র আর এক লৌকিক পিরের সন্ধান পাওয়া যায়। যার লোকনাম জগন্নাথ পির। এই পিরের মূর্তিতে হাত-পা কাটা বা ভাঙা, আরাধনা করেন মুসলমান পরিবার। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই পিরের পুজো দেন। গ্রাম রক্ষার দেবতা হিসাবে তিনি পূজিত হন। জগন্নাথ পির শুধু গ্রামরক্ষক দেবতা নন, তিনি শিশু রক্ষক দেবতা হিসাবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে পূজিত।[২৭] বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম প্রভৃতি জেলার অসংখ্য নবদম্পতিরা এই পিরসাহেবের কাছে আসেন। সন্তান পাবার জন্য মানত করেন। পিরের আস্তানায় হত্যে দিয়ে শিরনি প্রসাদ গ্রহণ করে। সন্তান হলে দম্পতিরা শিশুটিকে নিয়ে পিরের কাছে এসে মাথা কামিয়ে নেন এবং শিশুটির কেশগুচ্ছ জগন্নাথ পিরকে উৎসর্গ করেন। গ্রামের একটি ছোট্ট ঘরে কাঠের সিংহাসনে রয়েছে জগন্নাথ পির। গায়ে কাপড় জড়ানো, গলায় মুসলমানি তাবিজ। পাশে রয়েছে বড়ো বড়ো দুটি মাটির ঘোড়া ও নাড়ুগোপালের মূর্তি। আস্তানার পাশের ঘরে রয়েছে জাহের খাদিমের কবর। জগন্নাথ পিরের নিত্য পুজো হয় হিন্দু মুসলমান ধর্মের নিয়ম মেনে। শারদীয়া নবমী তিথিতে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পিরপুকুর থেকে ঘট ভরে আনা হয়। সেই ঘট পেতে হয় পুজো। শিরনি হিসাবে দেওয়া হয় ফল-মূল মিষ্টান্ন। গ্রামবাসীরা ভক্তিভরে পুজো দেন। প্রতি বছর মাঘ মাসের ২৬ তারিখে পিরের বাৎসরিক উৎসব হয়। সকলকে খাওয়ানো হয় খিচুড়ি। এদিন শোনা যায় ফকিরি গান, কাওয়ালি, সত্যপিরের পালাগান প্রভৃতি। জগন্নাথ পিরের আস্তানায় যিনি খাদিমের দায়িত্ব পালন করেন তিনি হলেন টিটো, তার প্রকৃত নাম শাহ আলম। তাঁর মুখ থেকে জগন্নাথ পিরের ইতিহাস জানা যায়। বহু বছর আগে শাহ আলমের এক পূর্বপুরুষ ইশা বা মুসা অযোধ্যায় ভ্রমণ করার সময় একটি ধাতব জগন্নাথ মূর্তি কুড়িয়ে পান। তিনি যত্ন সহকারে বাড়িতে মূর্তিটাকে প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানের বাড়িতে জগন্নাথের মূর্তি দেখে প্রতিবেশীরা নানা কথা শোনাতে লাগলেন। কারণ ইসলাম ধর্মে মূর্তিপুজো নিষিদ্ধ। প্রতিবেশীরা একদিন মূর্তিটাকে নিকটবর্তী এক পুকুরে ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার কিছুদিন পর থেকে শুরু হয় দৈব-দুর্বিপাক। এইদিকে সুফি আদর্শে বিশ্বাসী ইশা বা মুসা জগন্নাথকে না পেয়ে খুব কষ্ট পান। দৈব-দুর্বিপাকে খুব ভয় পেয়ে যান প্রতিবেশীরা। তাঁরা ক্রমশ বুঝতে পারল- ঐ মূর্তি জলে ফেলে দেওয়ার জন্যই এমন অবস্থা তাদের। শেষে ডোবা থেকে যখন মূর্তিটি তোলা হল তখন প্রতিবেশীরা দেখলেন এ ধাতব মূর্তি নয়। হাত-পা ভাঙা কালো রঙের বিগ্রহ। অর্থাৎ ঠুঁটো জগন্নাথ। মাথায় সামান্য পাগড়ির মত। উচ্চতা দশ ইঞ্চি। পুনরায় জগন্নাথ পিরকে পুজোর জন্য প্রতিষ্ঠা করেন।[২৮] সেই থেকেই মুসলমানদের কাছে পরিচিত হলেন বুড়োরাজ বা বুড়োপির আর হিন্দুদের কাছে জগন্নাথ পির। নাম যায় হোক বর্তমান সময়ে এই জগন্নাথ পির লৌকিক পির হিসাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সম্প্রীতির বার্তা বহন করে আসছে।

তথ্যসূত্র:

১. Uddin, Sufi. Beyond National Borders and Religious Boundaries: Muslim and Hindu Veneration of Bonbibi. (Mathew N. Schmalz and Peter Gottschalk ed.) Engaging South Asian Religions: Boundaries, Appropriations, and Resistances, State University of New York Press, New York, 2011, pp. 61-82.

২. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। বাংলার লৌকিক দেবতা। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, দেজ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১৯৩।

৩. ঠাকুর, স্বপনকুমার। রাঢ় কথা মননে সমীক্ষণে। নান্দনিক প্রকাশনী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৯৬-৯৭।

৪. L.S.S., O'Malley. Bengal District Gazetteers. Murshidabad, The Bengal Secretariat Book Dept., Calcutta, 1914, pp. 210-211.

৫. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। হুগলী জেলার পুরাকীর্তি। প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ. ৭৫।

৬. ভট্টাচার্য, চন্দ্রশেখর। মুসলমানের দুর্গাপুজো। জনস্বার্থ প্রকাশন, কলকাতা, বইমেলা ২০২৪, পৃ. ৪৭–৫০।
৭. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। হুগলী জেলার পুরাকীর্তি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
৮. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, সহায়তা- বাবলু মন্ডল ও শিশির মন্ডল, কলাছরা পল্লি, চন্ডিতলা, হুগলি।
৯. ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ। বঙ্গে সুফি প্রভাব ও সুফি তত্ত্বের ক্রমবিকাশ। রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৮, পৃ. ২১৭।
১০. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, বালাইচাঁদ চক্রবর্তী ও উমেশ মালিক, খাজুটিপাড়া, নানুর, বীরভূম।
১১. (বীরভূমের মহম্মদ বাজারের ভাঁড়কাটা গ্রামে মুসলমানদের উদ্যোগে কালীপূজা),
https://www.anandabazar.com/amp/west-bengal/purulia-birbhum-bankuraতাং ৮/১১/২০১৫.
১২. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, রাসু দাস ও কাসেম মল্লিক, বড়ুয়া, মুর্শিদাবাদ।
১৩. তথ্য দানে সহায়তা করেছেন সেবায়ত খোকন বিশ্বাস।
১৪. ক্ষেত্র সমীক্ষায় সাহায্য করেছেন বসির সেখ, মামনি হালদার ও অন্যান্য, মুনুটিয়া- নওপুকুরিয়া- কাটাইকোনা, বেলডাঙ্গা-২ ব্লক, মুর্শিদাবাদ।
১৫. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, সহায়তা করেছেন কিলটন মল্লিক, দ্রষ্টব্য; Anandabazar Patrika, "মুসলিম পরিবারে তৈরি হওয়া ঘি ছাড়া 'অভুক্ত' থাকেন সিদ্ধেশ্বর", Purulia-Birbhum-Bankura বিভাগ, ৭ মে ২০২২।
১৬. Banerjee, Subhas Chandra. Folk Religion of Bengal. Firma KLM Pvt. Ltd., Calcutta, 1969, p Pp. 175–190.
১৭. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, দ্রষ্টব্য
১৮. সেখ, মো: আফরুক। রাঢ় বাংলার লৌকিক দেবদেবী। পুস্তক বিপণী, জানুয়ারি ২০২১, কলকাতা, পৃ. ৪৬-৫০।
১৯. তদেব, পৃ. ৫৬–৬০।
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার। বাঁকুড়ার মন্দির। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ. ৪৭।
২১. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, সহায়তা করেছেন সৈয়দ আতাউর রহমান, বড়পলাশন, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান।
২২. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা। সহায়তা করেছেন রিপন শেখ ও স্বপন কুমার ঠাকুর, শ্রীবাটি, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান।
২৩. কামিল্যা, মিহির চৌধূরী। বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১ ফেব্রু. ২০০৯, পৃ. ৭০।
২৪. ক্ষেত্র সমীক্ষায় সাহায্য করেছেন পূজারি কানাইলাল চক্রবর্তী ও নিতাইচাঁদ চক্রবর্তী, জোৎস্না খাতুন, রহিমা বেগম, ইচু ভাগড়া, মন্তেশ্বর, পূর্ব বর্ধমান।
২৫. তথ্যদানে সহায়তা করেছেন মোহাম্মদ আইয়ূব হোসেন, রাজুয়া, কাটোয়া, বর্ধমান।
২৬. সেখ, মো: আফরুক। রাঢ় বাংলার লৌকিক দেবদেবী। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।
২৭. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষায় সংগ্রহ, দ্রষ্টব্য: সেখ, মো: আফরুক, রাঢ় বাংলার লৌকিক দেবদেবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮- ৬৯।
২৮. ঠাকুর, স্বপন কুমার: রাঢ় কথা মননে সমীক্ষণে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।